IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটোগল্পে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব: মধ্যবিত্ত অস্তিত্বসংকট, নৈতিক দ্বন্দ্ব ও অন্তর্জাগতিক শিল্পরূপ

কাঞ্চন পাল

গবেষক, বাংলা বিভাগ, সোনাদেবী বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খণ্ড

State Aided College, THLH Mahavidyalay, Birbhum, West Bengal

চলভাষ-৯৮০০৫৬৬৮৫৬

সারসংক্ষেপ (Abstract):

বাংলা ছোটোগল্পের আধুনিক পর্বে সন্তোষকুমার ঘোষ এক স্বতন্ত্র শিল্পচেতনার অধিকারী কথাশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর প্রেমভিত্তিক গল্পসমূহে রোমান্টিক আবেগের পরিবর্তে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, নৈতিক সংকট এবং মধ্যবিত্ত অস্তিত্ব-দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। এই প্রবন্ধে তাঁর নির্বাচিত প্রেমকেন্দ্রিক ছোটোগল্পসমূহের আলোকে প্রেমের ধারণা, আত্মদ্বন্দ্ব, স্মৃতি-চেতনা, নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষমতাবিন্যাস, ভাষাশৈলী এবং অসমাপ্ত সমাপ্তির শিল্পরীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সন্তোষকুমার ঘোষ প্রেমকে পূর্ণতার নয়, বরং অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া হিসেবে নির্মাণ করেছেন। প্রেম তাঁর গল্পে ব্যক্তিমানসের গূঢ় স্তর উন্মোচনের এক কার্যকর শিল্পমাধ্যম।

Key word: সন্তোষকুমার ঘোষ, প্রেম, মনস্তত্ত্ব, মধ্যবিত্ত জীবন, আত্মদ্বন্দ্ব, স্মৃতি, নৈতিকতা, আধুনিক ছোটোগল্প।

বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাসে ব্যক্তি-অন্তর্জগতের অনুসন্ধান একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। উনিশ শতকে সামাজিক বাস্তবতা ও জাতীয় চেতনার প্রশ্ন যেখানে মুখ্য ছিল, বিশ শতকের মধ্যভাগে এসে ব্যক্তি-মানসের জটিলতা সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রে স্থান পায়। এই পর্বে ছোটোগল্প কেবল সামাজিক ঘটনাবলীর বিবরণ নয়; বরং ব্যক্তি-অস্তিত্বের গভীর অন্বেষণ হয়ে ওঠে। এই ধারার এক উল্লেখযোগ্য শিল্পী সন্তোষকুমার ঘোষ। "মনে হয় সন্তোষকুমার ঘোষ ব্যক্তির কথা বলতে বলতে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সমস্যায় ডুব দিয়ে শেষমেশ মানুষ যে কৃত্রিম, যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে এই বোধে স্থির হতে চেয়েছেন।"[১] সাংবাদিকতা ও সাহিত্য—এই দ্বৈত পরিচয়ের সমন্বয়ে তিনি এক বাস্তবনিষ্ঠ অথচ মনস্তাত্ত্বিক গভীরতাসম্পন্ন শিল্পরীতি নির্মাণ করেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র সন্তোষকুমার ঘোষের এক সংবর্ধনা সভায় বলেছিলেন – "সন্তোষ ছিল নতুনত্বের নবীনতার উপাসক। এটাই তার সম্পর্কে প্রথম কথা এবং শেষ কথা।"[২] তাঁর প্রেমভিত্তিক গল্পসমূহ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়, প্রেম তাঁর কাছে আবেগের সরল প্রকাশ নয়; বরং তা এক নীরব অন্তর্দহন, এক নৈতিক সংশয়, এক অস্তিত্বগত প্রশ্ন। সন্তোষকুমার ঘোষের কথাসাহিত্যে প্রেম এমন এক বহুমাত্রিক ও জটিল অভিজ্ঞতা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে, যা কেবলমাত্র রোমান্টিক আবেগের সীমায় আবদ্ধ নয়; বরং তা মানুষের অস্তিত্ব, সমাজবাস্তবতা এবং গভীর মনস্তাত্ত্বিক স্তরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর গল্পসমূহে প্রেম কখনোই সরল, স্বচ্ছ

বা নিটোল নয়—বরং তা দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, আকাঙ্ক্ষা, বিকার, অসহায়তা ও আত্মসংঘাতের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁর প্রেমভাবনাকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, তিনি প্রেমকে জীবনের এক গভীর দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখেছেন।

প্রথমত, তাঁর প্রেমচেতনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—প্রেম ও যৌনতার সম্পর্ককে তিনি কখনোই চটুলতা বা নগ্ন বাস্তবতার স্তরে নামিয়ে আনেননি। যৌনতা তাঁর গল্পে অনুপস্থিত নয়, কিন্তু তা সর্বদা অন্তর্লীন, সূক্ষ্ম এবং মনস্তাত্ত্বিক পরিসরে নিহিত। ফলে প্রেম এখানে শারীরিক আকর্ষণের চেয়ে অধিকতর মানসিক ও অস্তিত্বগত টানাপোড়েনের বিষয় হয়ে ওঠে। প্রেম মানুষের ভেতরের গোপন ক্ষত, দহন, আকাঙ্ক্ষা এবং অপূর্ণতার অনুভূতিকে উন্মোচিত করে—যা অনেক সময় তাকে অসহায় ও নিঃসঙ্গ করে তোলে।

এই জটিল প্রেমভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ধরা পড়ে 'স্বয়ম্বরা' গল্পে। স্মরজিতের শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও তার আত্মনির্ভরতার সংগ্রাম এবং লীলার প্রতি তার গভীর নির্ভরতা—প্রেমকে এখানে এক প্রেরণাদায়ী শক্তিতে রূপান্তরিত করে। কিন্তু একই সঙ্গে লীলার মানসিক দ্বিধা, অনুপমের উপস্থিতি, এবং নিজের ভেতরের দুর্বলতা—এই সবকিছু মিলিয়ে প্রেমকে এক দ্বন্দ্বময় অভিজ্ঞতায় পরিণত করে। শেষ পর্যন্ত লীলার স্মরজিতের কাছে ফিরে আসা প্রেমের জয়কে নির্দেশ করলেও, এই জয় নিছক আবেগের নয়—এটি মানসিক পরিপক্কতা ও আত্মজয়ের ফল।

অন্যদিকে 'কস্তুরীমৃগ' গল্পে প্রেম এক নিঃশব্দ, গোপন এবং বেদনাময় অনুভূতি হিসেবে প্রকাশিত। অজয়ের মৃত্যুর পর নির্মলার মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা প্রেম এবং করবীর বৈধ দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে যে সূক্ষ্ম বৈপরীত্য, তা প্রেমের সামাজিক ও ব্যক্তিগত রূপের সংঘাতকে প্রকাশ করে। এখানে প্রেম একদিকে নিষিদ্ধ, অন্যদিকে তা গভীর মানবিক বেদনার উৎস।

'চীনেমাটি' গল্পে বকুলের দাম্পত্য জীবনের দুঃসহ অভিজ্ঞতা এবং কুঞ্জর চোখে ইন্দ্রাণীর কৃত্রিম জীবনযাপন—প্রেম ও সংসারের ভঙ্গুরতা এবং ভেতরের শূন্যতাকে উন্মোচিত করে। কুঞ্জর অনুভূতির আঘাত তার সমস্ত স্বপ্নভঙ্গ ঘটায়, যা প্রেমের ভাঙন ও বিভ্রমের বাস্তবতাকে সামনে আনে।

'শরিক' গল্পে উমা ও নীলিমার প্রেম-সংকট একই শূন্যতায় পর্যবসিত হয়—যেখানে প্রেম ব্যর্থতা ও হতাশার সমার্থক হয়ে ওঠে। 'সমান্তর' গল্পে স্বামী-স্ত্রীর রুচিভেদের কারণে তাদের সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা প্রেমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে—এখানে প্রেম থাকা সত্ত্বেও তা কার্যকর হয়ে ওঠে না।

'প্রেমপত্র' গল্পে সুধাময়ের মানসিক জগৎ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একদিকে অসুস্থ, প্রৌঢ়া স্ত্রী যুথিকা, অন্যদিকে যৌবনময় কনক—এই দ্বৈত আকর্ষণের মধ্যে সুধাময়ের মনোজগত যে দ্বন্দ্বে আক্রান্ত হয়, তা প্রেমের সঙ্গে যুক্ত বয়স, আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার সংঘাতকে প্রকাশ করে। এখানে প্রেম কেবল একটি সম্পর্ক নয়, বরং একটি মানসিক অভিজ্ঞতা, যা মানুষকে নিজের মধ্যেই বিভক্ত করে।

'সম্রাজ্ঞী', 'সুচিরাকে', 'স্ত্রৈণ', 'ছায়াঘর', 'ঘ্রাণ', 'মনসিজা' প্রভৃতি গল্পে প্রেমের নানান দিক প্রতিফলিত হয়েছে—কোথাও তা অভ্যাস, কোথাও মোহ, কোথাও স্মৃতি, কোথাও আবার মানসিক জটিলতার বহিঃপ্রকাশ। বিশেষত 'নেপথ্য' গল্পে মল্লিকা ও নয়নমোহনের সম্পর্কের যে দ্বিধা, সংকোচ ও ভয়—তা প্রেমের অপ্রকাশিত ও অবদমিত দিককে উন্মোচিত করে। যা দীর্ঘদিন কাম্য ছিল, তা যখন বাস্তবের মুখোমুখি হয়, তখন তা গ্রহণ করার সাহস মানুষের থাকে না—এই গভীর মনস্তত্ত্বকে লেখক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ধরেছেন।

'চিররূপা', 'সে আমার প্রেম', 'গহনমোহ', 'যে কোন', 'জীয়নকাঠি' প্রভৃতি গল্পে প্রেমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঘৃণা, আকর্ষণ, নিষ্ঠুরতা ও আত্মবিসর্জনের জটিল অনুভূতি। বিশেষ করে 'জীয়নকাঠি' গল্পে রতীনের মানসিক রূপান্তর—যেখানে ঘৃণা থেকে জন্ম নেয় এক ধরনের করুণ ভালোবাসা—প্রেমের এক গভীর ও ট্র্যাজিক দিককে সামনে আনে।

তবে সন্তোষকুমার ঘোষ এখানেই থেমে থাকেননি। তিনি প্রেমের বিকারগ্রস্ত ও বিকলিত রূপকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। 'বিষ' গল্পে মৈত্রেয়ীর আত্মসংঘাত—নিজের মধ্যেই শাশুড়ির চরিত্রের পুনরাবৃত্তি অনুভব করে আত্মবিনাশের পথে যাওয়া—প্রেমের সঙ্গে যুক্ত অহং, ব্যক্তিত্ব ও মানসিক বিকারের এক

চরম প্রকাশ। 'মনে মনে' গল্পে সুবিমলের মানসিকতা—যেখানে সে মানুষকে নয়, তাদের অসুস্থতাকে ভালোবাসে—প্রেমকে এক ধরনের বিকৃত মানসিক প্রবণতায় পরিণত করে।

'দুই কাননের পাখি' গল্পে পেশাগত যান্ত্রিকতা দাম্পত্য প্রেমকে ধ্বংস করে দেয়, 'সমীকরণ' গল্পে নৈতিক দুর্বলতা প্রেমকে কলুষিত করে, এবং 'আড়াল' গল্পে নীলিমার সম্পর্ক মানসিক বিকারের দিকেই ইঙ্গিত করে। এই সমস্ত গল্পে প্রেম আর জীবনদায়ী শক্তি নয়—বরং তা মানুষের অন্তর্লীন অন্ধকার, বিকার ও ভাঙনের প্রতিফলন।

বাংলা ছোটোগল্পের বিকাশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবমনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের পথ সুগম করেন। 'চোখের বালি' উপন্যাসের সূচনা অংশে তিনি বলেছেন- " বঙ্গদর্শনের নবপর্যায় একদিকে তখন আমার মনকে রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ-নৈতিক চিন্তার আবর্তে টেনে এনেছিল, আর-এক দিকে এনেছিল গল্পে এমন-কি কাব্যেও মানবচরিত্রের কঠিন সংস্পর্শে। অল্পে অল্পে এর শুরু হয়েছিল সাধনার যুগেই, তার পরে সবুজপত্র পসরা জমিয়েছিল। চোখের বালির গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা। এই ঈর্ষা মহেন্দ্রের সেই রিপুকে কুৎসিত অবকাশ দিয়েছে যা সহজ অবস্থায় এমন করে দাঁত-নখ বের করত না। যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে। সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।"[৩] পরবর্তী সময়ে আধুনিকতাবাদী চেতনা ব্যক্তি-নির্ভর অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্রে নিয়ে আসে। এই প্রেক্ষাপটে সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পগুলি মধ্যবিত্ত নগরজীবনের অন্তর্লোক উন্মোচন করে। "তার বয়স যখন বাইশ-তেইশ, তখনই সে জেনে গিয়েছিল যে, টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের হাসির মতন অনেক ব্যাপারই বস্তুত নকল ব্যাপার; জেনে গিয়েছিল, অমৃতভাণ্ড ভেবে মানুষ যাতে মুখ ডোরায়, তার ভিতরে গরল থাকা কিছু বিচিত্র নয়, অনেক ক্ষেত্রে থাকেও।"[৪] তাঁর সময়ে সমাজে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল—রাজনৈতিক টানাপোড়েন, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, মূল্যবোধের পরিবর্তন। এই সামাজিক রূপান্তর ব্যক্তিমানসে এক গভীর অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। ফলে প্রেমও আর নিছক ব্যক্তিগত অনুভূতি থাকে না; তা সামাজিক ও নৈতিক প্রশ্নে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পে প্রেম কখনোই সম্পূর্ণ সন্তোষ বা তৃপ্তির ক্ষেত্র নয়। বরং প্রেম এক অসম্পূর্ণতার অভিজ্ঞতা। "সন্তোষকুমার ঘোষ কোনও সময়েই নিটোল প্রেমের গল্প লেখেননি, প্রেমের কথা বলতে গিয়ে দগদগে ঘায়ের মত মোটা দাগে যৌনতা ও সঙ্গমের চিত্র উপহার দেননি। তাঁর প্রেমভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সূক্ষ্মভাবে যৌনতা, তীক্ষ্ণ মনস্তত্ত্ব, মনোবিকলন। প্রেম মানুষকে কখনো কখনো কত যে অসহায় করে তার সার্থক শিল্পরূপ সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পে মেলে।"[৫] চরিত্ররা ভালোবাসে, কিন্তু সেই ভালোবাসা প্রায়শই প্রকাশহীন, স্বীকৃতিহীন অথবা অপূর্ণ থেকে যায়। এই অসম্পূর্ণতা কেবল কাহিনির কৌশল নয়; এটি তাঁর প্রেম-দর্শনের অংশ। প্রেম মানুষের অন্তর্জগতে এক প্রশ্নচিহ্ন সৃষ্টি করে—আমি কে? আমি কী চাই? আমার আকাঙ্ক্ষা ও নৈতিকতার সংঘাত কোথায়? ফলে প্রেম হয়ে ওঠে আত্ম-অন্বেষার পথ। প্রেমের মধ্যে ব্যক্তি নিজের সীমাবদ্ধতা, ভয়, সংকোচ এবং সাহসকে আবিষ্কার করে।

সন্তোষকুমার ঘোষের প্রেমভিত্তিক গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আত্মদ্বন্দ্ব। তাঁর চরিত্ররা প্রায়শই সিদ্ধান্তহীন, দ্বিধাগ্রস্ত এবং আত্মসমালোচনায় নিমগ্ন। তারা ভালোবাসে, কিন্তু সেই ভালোবাসাকে সামাজিক ও নৈতিক কাঠামোর মধ্যে বিচার করতে বাধ্য হয়।সন্তোষকুমার ঘোষের কথাসাহিত্যে প্রেমের বহুমাত্রিক রূপ বিশ্লেষণ করতে গেলে 'কস্তুরীমৃগ' ও 'স্বয়ম্বরা' গল্প দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সন্তোষকুমার ঘোষ এই গল্পদ্বয়ে প্রেম একদিকে যেমন মানবিক সহানুভূতি ও অন্তর্লীন আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ, অন্যদিকে তা সামাজিক স্বীকৃতি, ব্যক্তিগত সংকট ও মানসিক দ্বন্দ্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক জটিল অভিজ্ঞতা হিসেবে উদ্ভাসিত হয়েছে।

প্রথমত, 'কস্তুরীমৃগ' গল্পে প্রেমের যে রূপটি চিত্রিত হয়েছে, তা নিঃশব্দ, গোপন এবং সামাজিকভাবে অস্বীকৃত প্রেম। অধ্যাপক অজয় এবং নিম্নতলার ভাড়াটে বিধবা নির্মলার সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে সহানুভূতির মাধ্যমে। দাদা-বৌদির অত্যাচারে অতিষ্ঠ নির্মলা যখন তার জীবনের দুঃখকথা অজয়কে জানায়, তখন অজয়ের মনে তার প্রতি এক গভীর মমত্ববোধ জন্ম নেয়, যা ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়।

এই প্রেম কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠা পায় না; বরং তা ব্যক্তিগত অনুভূতির স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে। অজয় নির্মলাকে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে দিতে সেলাই শেখানোর কাজে নিযুক্ত করে, যার ফলে নির্মলার জীবনে নতুন আলোর সঞ্চার ঘটে। কিন্তু এই সম্পর্ক আকস্মিকভাবে ছিন্ন হয় অজয়ের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। অজয়ের মৃত্যুর পর নির্মলার মানসিক অবস্থাই গল্পটির কেন্দ্রীয় তাৎপর্য বহন করে। করবী, বৈধ স্ত্রী হিসেবে প্রকাশ্যে শোক প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু নির্মলা পারে না—কারণ তার প্রেম সামাজিক স্বীকৃতিহীন। এই অবস্থায় নির্মলার অন্তর্দাহ এক গভীর নীরব বেদনায় রূপ নেয়, যা প্রকাশ পায় তার এই লেখায়—"পারলাম না, আজ আমার কী গেল।"[৬] (গল্পসমগ্র-১, পৃ. ১৩০) কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সামাজিক ভয়ের কারণে সে তা মুছে ফেলতে বাধ্য হয়—"কেউ না দেখে, কেউ যেন না জানতে পায়।"[৭] (গল্পসমগ্র-১, পৃ. ১৩০)

এই দুই উক্তির মধ্য দিয়ে নির্মলার প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্ট হয়। তার প্রেম গভীর, সত্য ও আত্মিক; কিন্তু সামাজিক স্বীকৃতি না থাকায় তা প্রকাশের অধিকার থেকে বঞ্চিত। ফলে তার শোকও ব্যক্তিগত ও নীরব থেকে যায়। এখানে লেখক দেখিয়েছেন যে, প্রেমের সত্যতা সামাজিক স্বীকৃতির উপর নির্ভর করে না; বরং তা মানুষের অন্তর্জগতের একান্ত অনুভূতি, যা অনেক সময় প্রকাশের সুযোগ না পেলেও তার গভীরতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

অন্যদিকে, 'স্বয়ম্বরা' গল্পে প্রেম এক প্রেরণাদায়ী শক্তি হিসেবে প্রতিভাত হলেও, তার মধ্যে রয়েছে তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব ও আত্মসংঘাত। নায়ক স্মরজিৎ শারীরিকভাবে অসম্পূর্ণ—তার একটি হাত কাঠের; তবুও সে আত্মনির্ভরতার সংগ্রামে অবিচল। এই সংগ্রামের পেছনে প্রেম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। লীলা প্রথমে অনুপমকে প্রত্যাখ্যান করলেও, পরে অনুপমের পরিবর্তিত অবস্থান তার মনে নতুন দ্বিধার সৃষ্টি করে।

গল্পটির মূল শক্তি নিহিত রয়েছে লীলার মানসিক টানাপোড়েনে। স্মরজিতের প্রতি তার আকর্ষণ একদিকে গভীর ও অবদমিত, অন্যদিকে তার সামাজিক রুচি ও মানসিক অভ্যাস সেই আকর্ষণকে অস্বীকার করতে চায়। স্মরজিতের ফার্মের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করে লীলা একধরনের বিমুখতায় আক্রান্ত হয় এবং আকস্মিকভাবে তার প্রতি রূঢ় আচরণ করে। কিন্তু সেই বিমুখতা স্থায়ী হয় না; বরং তার অন্তরে লুকিয়ে থাকা আকর্ষণ তাকে আবার স্মরজিতের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে নিম্নোক্ত উক্তিতে—"নিজের রুচি আর অন্ধ আকর্ষণের সংঘাত। নিজের সঙ্গেই ক্লান্তিকর এক লুকোচুরি।"[৮](গল্পসমগ্র-১, পৃ. ১৪১) এখানে লীলার মানসিক অবস্থার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। সে নিজের মনকে নিজেই বুঝতে পারে না; ফলে সুস্থ, সবল অনুপমের প্রতি আকর্ষণের পাশাপাশি স্মরজিতের শারীরিক অক্ষমতা তার মনে একধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করে। স্মরজিতের কাঠের হাত দেখে তার শিউরে ওঠা এবং তাকে প্রত্যাখ্যান করা—এই মানসিক দ্বৈততারই বহিঃপ্রকাশ।

কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানের পর লীলার জীবনে যে শূন্যতা ও ভীতি সৃষ্টি হয়, তা তাকে আত্মঅন্বেষণের দিকে ঠেলে দেয়। একা পথ চলার ভয় এখানে প্রতীকী অর্থে জীবনের অনিশ্চয়তা ও অস্তিত্বসংকটকে নির্দেশ করে। এই সংকট অতিক্রম করে লীলা শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করে তার প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা এবং ফিরে আসে স্মরজিতের কাছে—"ফিরে যেতে পারেনি, ফিরে এসেছে।"[৯](গল্পসমগ্র-১, পৃ. ১৪৫) এই প্রত্যাবর্তন কেবল প্রেমিকের কাছে ফেরা নয়; বরং এটি এক মানসিক পরিণতির প্রকাশ, যেখানে লীলা নিজের দ্বন্দ্ব, দ্বিধা ও সামাজিক রুচির সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে মানবিকতার স্তরে পৌঁছায়। ফলে 'স্বয়ম্বরা' গল্পে প্রেম কেবল আবেগ নয়, বরং আত্মসংঘাতের মধ্য দিয়ে অর্জিত এক গভীর উপলব্ধি।

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, 'কস্তুরীমৃগ' ও 'স্বয়ম্বরা' গল্পে সন্তোষকুমার ঘোষ প্রেমের দুটি ভিন্ন কিন্তু সমান্তরাল দিককে চিত্রিত করেছেন। 'কস্তুরীমৃগ'-এ প্রেম নীরব, গোপন এবং সামাজিকভাবে বঞ্চিত—যেখানে অনুভূতির গভীরতা প্রকাশের সুযোগ পায় না; অন্যদিকে 'স্বয়ম্বরা'-তে প্রেম মানসিক দ্বন্দ্ব ও আত্মসংঘাত অতিক্রম করে আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অতএব, এই দুটি গল্প বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, সন্তোষকুমার ঘোষ প্রেমকে কখনোই একরৈখিক বা সরল আবেগ হিসেবে দেখেননি। তাঁর কাছে প্রেম এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, যা মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতি, সামাজিক

বাস্তবতা ও অস্তিত্বসংকটের সম্মিলিত ফল। এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর প্রেমকেন্দ্রিক গল্পগুলিকে বাংলা কথাসাহিত্যে এক স্বতন্ত্র ও গভীর তাৎপর্য প্রদান করেছে।

আত্মদ্বন্দ্বের নির্মাণে তিনি বহিরঙ্গ ঘটনাকে সীমিত রাখেন। একটি সামান্য ঘটনা—একটি চিঠি, একটি সাক্ষাৎ, একটি স্মৃতিচারণ—চরিত্রের মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই অন্তর্জাগতিক আলোড়নই গল্পের প্রকৃত নাটক। সন্তোষকুমার ঘোষের কথাসাহিত্যে প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের একটি অনন্য উদাহরণ হল 'মনে মনে' গল্প। সন্তোষকুমার ঘোষ এই গল্পে প্রেম কোনো সরল, স্বাভাবিক বা সামাজিকভাবে স্বীকৃত সম্পর্কের রূপে উপস্থিত নয়; বরং তা এক জটিল মানসিক প্রবণতা, অভ্যাসগত অনুভূতি, অবদমিত আকাঙ্ক্ষা এবং কল্পনানির্ভর আত্মপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নির্মিত। ফলে এই গল্পে প্রেম বাস্তবের চেয়ে অধিকতর মানসিক ও অন্তর্জাগতিক অভিজ্ঞতা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুজাতা, যে একসময় সুবিমলকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সুজাতা উপলব্ধি করে যে সুবিমলের প্রেমের প্রকৃতি স্বাভাবিক নয়। সুবিমলের আকর্ষণ সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের প্রতি নয়; বরং সে আকৃষ্ট হয় রুগ্ন, শীর্ণ ও অসুস্থ মানুষের প্রতি। এই প্রবণতার পেছনে রয়েছে তার অতীত অভিজ্ঞতা—অসুস্থ মায়ের দীর্ঘদিনের সেবা করতে করতে তার মধ্যে এক ধরনের মানসিক অভ্যাস গড়ে ওঠে, যা পরবর্তীকালে তার প্রেমবোধকে বিকৃত করে দেয়। ফলে সে সুস্থ সুজাতার থেকে ক্রমশ দূরে সরে গিয়ে অসুস্থ সীতার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

এই ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয় যে, সুবিমলের কাছে প্রেম কোনো ব্যক্তিমানুষকে কেন্দ্র করে নয়; বরং তা এক ধরনের মানসিক বিকার, যেখানে 'অসুস্থতা'ই ভালোবাসার প্রধান অবলম্বন। সুজাতা এই সত্য উপলব্ধি করতে পারলেও, তার প্রেম একেবারে লোপ পায় না; বরং তা এক গভীর বোধে রূপান্তরিত হয়, যা তাকে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলে। গল্পের পরবর্তী অংশে বহু বছর পরে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত সুজাতা 'নিরাময়' হাসপাতালে ভর্তি হয়। সেখানে এক মেল নার্সের মধ্যে সে সুবিমলের সাদৃশ্য খুঁজে পায়। কিন্তু এই সাদৃশ্যের বাস্তবতা যাচাই করার জন্য সে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে না। বরং সে নিজের মনের ভেতরেই একটি কল্পনার জগৎ নির্মাণ করে, যেখানে ওই নার্সকেই সে সুবিমল হিসেবে কল্পনা করে নেয় এবং তার সঙ্গে এক নীরব, অন্তর্মুখী সংলাপে লিপ্ত হয়।

এই কল্পনার মধ্যেই সুজাতা সুবিমলের প্রতি তার দীর্ঘদিনের জমে থাকা অভিমান, উপলব্ধি ও সমালোচনা প্রকাশ করে—"তোমাকে যদি এতটুকু চিনে থাকি সুবিমল, তবে তুমি জীবনে কাউকে ভালবাসনি। তোমার মাকেও না, সীতাদিকে না। ভালবেসেছ তাঁদের অসুখকে। অসুখকে ভালবাসাও তোমার একটা অসুখ, তুমি নিজেও জানো না।"[১০](গল্পসমগ্র-১, পৃ. ৩২৭) এই উক্তির মাধ্যমে সুবিমলের চরিত্রের গভীরতম সত্য উন্মোচিত হয়। এখানে প্রেম আর কোনো মানবিক সংযোগ নয়; বরং তা এক প্রকার মানসিক আসক্তি, যেখানে অসুস্থতা ও দুর্বলতাই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। সুজাতা এই সত্যকে উপলব্ধি করে, কিন্তু বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে তা যাচাই করার প্রয়োজন অনুভব করে না। তার কাছে এই মানসিক সংলাপই যথেষ্ট। গল্পের শেষে সুজাতা সুস্থ হয়ে ওঠার পরও সেই মেল নার্সটির প্রকৃত পরিচয় জানার কোনো চেষ্টা করে না। বরং সে এই অনিশ্চয়তাকেই স্বীকার করে নেয়—"সারা জীবন কত দেখলুম, জানলুম, শিখলুম। জেনেই বা কী লাভ হল। একটি জিজ্ঞাসা না হয় চিরদিনের মতো নিরুত্তর থেকেই গেল।"[১১] (গল্পসমগ্র-১, পৃ. ৩২৮)

এই সিদ্ধান্তের মধ্যে সুজাতার এক গভীর দার্শনিক বোধ প্রতিফলিত হয়। সে উপলব্ধি করে যে, জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর জানা আবশ্যক নয়; কিছু প্রশ্নের অনুত্তরিত থাকাই মানুষের অভিজ্ঞতাকে আরও গভীর ও তাৎপর্যময় করে তোলে। বাস্তবের নিশ্চিততার চেয়ে কল্পনার অস্পষ্টতাই এখানে অধিক সত্য হয়ে ওঠে।

অতএব, 'মনে মনে' গল্পে সন্তোষকুমার ঘোষ প্রেমকে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন। এখানে প্রেম কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা স্মৃতি, অভ্যাস, কল্পনা এবং মানসিক বিকারের সম্মিলিত রূপ। সুজাতা ও সুবিমলের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন, প্রেম কখনো কখনো বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একান্তই মানসিক অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়, যা ব্যক্তির অন্তর্জগতে গভীরভাবে প্রোথিত থাকে।

সুতরাং, এই গল্পের বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, সন্তোষকুমার ঘোষ প্রেমকে নিছক আবেগ বা সম্পর্ক হিসেবে দেখেননি; বরং তিনি প্রেমের অন্তর্নিহিত মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, বিকার ও আত্মঅন্বেষণের দিকগুলিকে গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন। 'মনে মনে' গল্পে প্রেমের এই অন্তর্মুখী, আত্মনির্ভর ও কল্পনানির্ভর রূপ তাঁর কথাসাহিত্যে এক স্বতন্ত্র মাত্রা সংযোজন করেছে, যা বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। মনস্তত্ত্বের এই বিশ্লেষণে তিনি মানব-সত্তার দ্বৈততাকে স্পষ্ট করেন। একই ব্যক্তি প্রেমময় হলেও স্বার্থপর হতে পারে; সংবেদনশীল হলেও ভীরু হতে পারে। এই দ্বৈততাই তাঁর গল্পকে বাস্তবসম্মত ও গভীর করে তোলে।

সন্তোষকুমার ঘোষ মূলত নগর-মধ্যবিত্ত জীবনের কথাকার। তাঁর প্রেমকেন্দ্রিক গল্পে মধ্যবিত্ত মানসিকতার সংকোচ, সামাজিক মর্যাদাবোধ এবং অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সন্তোষকুমার ঘোষের কথাসাহিত্যে প্রেমের বহুবিধ রূপের অনুসন্ধান করতে গেলে 'পারাবত' ও 'ছাপ' গল্প দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সন্তোষকুমার ঘোষ এই গল্পদ্বয়ে প্রেম একদিকে যেমন জীবনের কঠোর বাস্তবতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অন্যদিকে তা মানুষের অন্তর্লীন আকাঙ্ক্ষা, স্মৃতি ও আবেগের গভীরতম স্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক জটিল অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়েছে।

প্রথমত, 'পারাবত' গল্পে প্রেমের যে রূপটি চিত্রিত হয়েছে, তা মূলত অভিনয়ভিত্তিক, আর্থিক প্রয়োজননির্ভর এবং গভীরভাবে বেদনাময়। গল্পটি টিবি রোগে আক্রান্ত সুলতার দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত, যার ফলে ঘটনাগুলি এক ধরনের আবেগময় ও অন্তর্মুখী ব্যঞ্জনা লাভ করে। 'রক্ষিত স্পেশাল' ট্রাভেল এজেন্সির কর্মী সিতেশ ও শিপ্রা তাদের আচরণ, ব্যবহার ও পরস্পরের ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে যাত্রীদের মনে এক আদর্শ নবদম্পতির প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করে। এমনকি সুলতাও তাদের সত্যিকারের দম্পতি বলে মনে করে। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে এই বিশ্বাস ভেঙে যায়। পাঁচ বছর পর একটি হোটেলে সুলতা সিতেশকে অন্য এক নারীর সঙ্গে একই রকম ঘনিষ্ঠতায় দেখতে পায়, যা তাকে বিস্মিত করে। পরে জানা যায়, শিপ্রা সিতেশের প্রকৃত স্ত্রী ছিল না, এমনকি বর্তমান সঙ্গিনীকেও সে বৈধ সম্পর্কের মধ্যে গ্রহণ করেনি। অর্থাৎ, সিতেশের এই প্রেমপ্রকাশ নিছক অভিনয়—যা তার জীবিকা নির্বাহের উপায়। এই পরিস্থিতি প্রেমকে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করে। এখানে প্রেম কোনো আন্তরিক অনুভূতি নয়; বরং তা বাজারজাত, পুনরাবৃত্ত এবং যান্ত্রিক এক অভিনয়। দারিদ্র্য ও আর্থিক অনিশ্চয়তা মানুষের জীবনকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে যায়, যেখানে প্রকৃত অনুভূতির চেয়ে অভিনয়ই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই অভিনয়ের মধ্যেও সিতেশের মানসিক ক্লান্তি ও অসন্তোষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে নিজেও এই জীবন থেকে মুক্তি চায়, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে তা সম্ভব হয় না। তার এই অসহায়তা প্রকাশ পায় নিম্নোক্ত উক্তিতে—"একে একে হোটেলের সমস্ত লোক চলে যাবে, ফের নতুন লোক এসে ঘর ভরবে। কিন্তু আমার ছুটি নেই। এই নিত্য নতুন আনাগোনার মধ্যে আমাকে রোজ বিকেলে যথারীতি পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হুকুম মাফিক ওই কালো কুরূপা মেয়েটিকে প্রেম নিবেদন করে যেতে হবে। আর মেয়েটিও পাশে দাঁড়িয়ে সেই পুরনো পচা প্রণয় বিদূষণ কলের পুতুলের মতো নির্বিকার হয়ে শুনবে। এর আর শেষ হবে না।"[১২] (গল্পসমগ্র-১, পৃ. ১৫১) এই উক্তির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়, প্রেম এখানে এক যান্ত্রিক, পুনরাবৃত্ত এবং প্রাণহীন ক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। ফলে 'পারাবত' গল্পে প্রেম তার স্বাভাবিক আবেগময়তা হারিয়ে এক করুণ বাস্তবতায় রূপান্তরিত হয়েছে, যেখানে মানুষ নিজের অনুভূতিকে বিসর্জন দিয়ে কেবল অভিনয়ের মাধ্যমে বেঁচে থাকে।

অন্যদিকে, 'ছাপ' গল্পে প্রেমের এক সম্পূর্ণ ভিন্ন কিন্তু সমানভাবে গভীর রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে প্রেম স্মৃতি, নিষ্ঠা এবং একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক অনন্য তাৎপর্য লাভ করেছে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নারী মার্থা একসময় বাঙালি যুবক শ্যামলকে ভালোবেসে বিবাহ করেছিল। কিন্তু সেই সম্পর্ক স্থায়ী হয়নি এবং জীবনের কঠোর বাস্তবতার চাপে মার্থা পতিতাবৃত্তিতে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। তবুও, এই পেশাগত পরিবর্তন তার প্রেমবোধকে সম্পূর্ণভাবে মুছে দিতে পারে না। বরং তার প্রেম এক গভীর স্মৃতি ও অনুসন্ধানে পরিণত হয়। মার্থা পতিতা হয়েও বাঙালি ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে শয্যাসঙ্গিনী হতে রাজি হয়নি। এই আচরণের পেছনে নিহিত রয়েছে তার একমাত্র প্রেম—

শ্যামলের প্রতি গভীর ও অবিচল অনুভূতি। প্রতিটি বাঙালি পুরুষের মধ্যেই সে যেন শ্যামলের প্রতিচ্ছবি খুঁজে বেড়ায়। এই মানসিকতারই চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে নিম্নোক্ত উক্তিতে—

"জীবনে মার্থা একবারই ভালবেসেছিল, শ্যামলদাকে। তারপর সারাজীবন ধরে অসংখ্যের ভেতর দিয়ে সে যে অনন্য পুরুষের খোঁজ করেছে, সে শ্যামলদা।"[১৩] (গল্পসমগ্র-১, পৃ. ১৮১) এই উক্তির মাধ্যমে মার্থার প্রেমের একনিষ্ঠতা ও গভীরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদিও সে বাস্তব জীবনে পতিতাবৃত্তির মতো পেশায় যুক্ত, তবুও তার অন্তর্জগত একমাত্র শ্যামলকেই ধারণ করে। এমনকি ফ্রেডারিক নামে এক ইংরেজ সৈন্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং তার সামনে বাঙালি পুরুষকে গ্রহণ করা—এই ঘটনাগুলিও তার প্রেমের প্রতি একনিষ্ঠতারই বহিঃপ্রকাশ।

গল্পের পরিণতিতে মার্থার অপমৃত্যু ঘটে এবং পুলিশের সন্দেহভাজনও একজন বাঙালি—এই ঘটনাও প্রতীকী অর্থ বহন করে। এটি যেন ইঙ্গিত করে যে, যার প্রতি সে সারাজীবন আকৃষ্ট ছিল, সেই সত্তার মধ্যেই তার জীবনের সমাপ্তি নিহিত। অতএব, 'পারাবত' ও 'ছাপ' গল্পের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ প্রেমের দুটি বিপরীত কিন্তু সমান্তরাল রূপকে তুলে ধরেছেন। 'পারাবত' -এ প্রেম হয়ে উঠেছে জীবিকার প্রয়োজনে অভিনীত এক যান্ত্রিক ক্রিয়া, যেখানে অনুভূতির স্থান দখল করেছে পুনরাবৃত্তি ও ক্লান্তি; অন্যদিকে 'ছাপ'-এ প্রেম একনিষ্ঠ, স্মৃতিনির্ভর এবং অবিচল—যা সমস্ত সামাজিক ও পেশাগত পরিবর্তনের মধ্যেও অটুট থাকে।

এই দুই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে লেখক প্রমাণ করেছেন যে, প্রেম কখনো বাস্তবতার চাপে বিকৃত ও শূন্য হয়ে যেতে পারে, আবার কখনো তা সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও এক গভীর মানসিক সত্য হিসেবে টিকে থাকতে পারে। এই দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গিই সন্তোষকুমার ঘোষের প্রেমভাবনাকে এক অনন্য ও গভীর সাহিত্যিক তাৎপর্য প্রদান করেছে।

মধ্যবিত্ত মানুষ প্রেমকে নিঃসংকোচে গ্রহণ করতে পারে না। পারিবারিক দায়িত্ব, সামাজিক বিধিনিষেধ এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতা তাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে। ফলে প্রেম হয়ে ওঠে অপরাধবোধের উৎস। এই শ্রেণির মানুষের মধ্যে আত্মসম্মান ও ভয়ের এক অদ্ভুত মিশ্রণ থাকে। তারা ভালোবাসতে চায়, কিন্তু সমাজের চোখে নিজেকে বিচার করতে ভয় পায়। এই মানসিক টানাপোড়েন তাঁর গল্পে গভীর বিষণ্নতার সুর সৃষ্টি করে। সন্তোষকুমার ঘোষের প্রেমভিত্তিক গল্পে নারীচরিত্রগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা কেবল আবেগের বাহক নয়; বরং আত্মসচেতন ও বিচারক্ষম। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষচরিত্র যেখানে দ্বিধাগ্রস্ত, নারীচরিত্র সেখানে অধিক দৃঢ়। নারীর নীরবতা তাঁর গল্পে এক শক্তিশালী ভাষা। এই নীরবতা আত্মসম্মান ও প্রতিবাদের প্রকাশ। প্রেমের সম্পর্কে নারী কেবল গ্রহণকারী নয়; বরং সে প্রশ্ন তোলে, প্রত্যাখ্যান করে, আত্মমর্যাদা রক্ষা করে। এই ক্ষমতার সমীকরণ প্রেমকে আরও জটিল করে তোলে। সম্পর্ক কেবল আকর্ষণের নয়; তা মর্যাদা ও স্বাধীনতার প্রশ্নেও আবদ্ধ।

সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পে স্মৃতি একটি কেন্দ্রীয় উপাদান। বর্তমানের প্রেম প্রায়শই অতীতের আলোকে বিচারিত হয়। চরিত্ররা স্মৃতির মধ্যে ফিরে যায় এবং নিজেদের সিদ্ধান্ত পুনর্মূল্যায়ন করে। সময়ের দূরত্ব প্রেমকে নতুন অর্থ দেয়। যে আবেগ একসময় তীব্র ছিল, তা পরে অনুতাপ বা বোধে পরিণত হয়। এই রূপান্তর প্রেমকে এক দার্শনিক মাত্রায় উন্নীত করে। স্মৃতির ব্যবহারে তিনি সময়কে একটি মনস্তাত্ত্বিক উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন

সন্তোষকুমার ঘোষের ভাষা সংযত ও ইঙ্গিতময়। তিনি আবেগের উচ্ছ্বাস এড়িয়ে চলেন। সংলাপ সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অর্থবহ। নীরবতা ও বিরতি তাঁর গল্পে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। বর্ণনার চেয়ে অন্তর্মুখী স্বগতোক্তি তাঁর প্রিয় কৌশল। এই আঙ্গিক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে গভীর করে এবং পাঠককে চরিত্রের মনের ভেতরে প্রবেশ করতে সহায়তা করে। তাঁর গল্পে সমাপ্তি প্রায়শই খোলা থাকে। সম্পর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটে না। এই অসমাপ্ততা বাস্তব জীবনের অনিশ্চয়তাকে প্রতিফলিত করে। পাঠক এখানে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। গল্পের ফাঁক পূরণ করে তাকে নিজস্ব ব্যাখ্যা নির্মাণ করতে হয়। এই শিল্পরীতি প্রেমকে একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করে। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁকে মানুষের বহুমুখী চরিত্র সম্পর্কে সচেতন করেছে। বাহ্যিক আচরণ ও অন্তর্লীন চিন্তার পার্থক্য তিনি গভীরভাবে

উপলব্ধি করেছিলেন। এই পর্যবেক্ষণ তাঁর প্রেমভিত্তিক গল্পে বাস্তবতার দৃঢ়তা এনে দিয়েছে। চরিত্রগুলি কাল্পনিক হলেও তাদের মানসিক টানাপোড়েন বাস্তবসম্মত।

মনস্তাত্ত্বিক সাহিত্যতত্ত্বের আলোকে বিচার করলে দেখা যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ প্রেমকে অবচেতন আকাঙ্ক্ষা ও নৈতিক সত্তার সংঘর্ষক্ষেত্র হিসেবে নির্মাণ করেছেন। তাঁর চরিত্ররা 'ইচ্ছা' ও 'দায়িত্ব'-এর দ্বন্দ্বে জর্জরিত। আধুনিকতাবাদী সাহিত্যচেতনার সঙ্গে তাঁর গল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষণীয়। ব্যক্তি-নির্জনতা, আত্মসংশয় এবং সম্পর্কের অনিশ্চয়তা আধুনিক জীবনের বৈশিষ্ট্য; তাঁর গল্পে এই বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট।

সন্তোষকুমার ঘোষের প্রেমভিত্তিক ছোটোগল্পসমূহ বাংলা সাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক গভীরতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি প্রেমকে রোমান্টিক পরিতৃপ্তির ক্ষেত্র হিসেবে নয়; বরং আত্মদ্বন্দ্ব, নৈতিক সংশয় এবং মধ্যবিত্ত অস্তিত্বসংকটের শিল্পরূপ হিসেবে নির্মাণ করেছেন। তাঁর গল্পে প্রেম মানে অনুসন্ধান, আত্মসমালোচনা এবং সময়ের মুখোমুখি দাঁড়ানো। এই দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা ছোটোগল্পকে এক নতুন গভীরতা প্রদান করেছে। অতএব বলা যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ প্রেম ও মনস্তত্ত্বের যে অন্তর্জাগতিক শিল্পরূপ নির্মাণ করেছেন, তা বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ধারায় এক স্থায়ী অবদান।

উৎসনির্দেশঃ--

১. বীরেন্দ্র দত্ত, সন্তোষ কুমার ঘোষঃ এক ব্যতিক্রমী কথাকার, শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন, বারুইপুর, প্রথম প্রকাশ ২৩ শে ভাদ্র ১৯৮৮, পৃষ্ঠা- ৬৪ ।
২. তদেব, পৃষ্ঠা- ২০৪ ।
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), শিক্ষাসচিব। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মহাকরণ। কলকাতা ০১, শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, প্রকাশ- আশ্বিন ১৩৯২ (অক্টোবর ১৯৮৫), পৃষ্ঠা-১৯৪ ।
৪. বীরেন্দ্র দত্ত, সন্তোষকুমার ঘোষঃ এক ব্যতিক্রমী কথাকার, শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন, বারুইপুর, প্রথম প্রকাশ ২৩ শে ভাদ্র ১৯৮৮, পৃষ্ঠা- ২০৪ ।
৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৯ ।
৬. সন্তোষকুমার ঘোষ, গল্পসমগ্র -১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণঃ- কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি ১৯৯৪, মাঘ ১৪০০, পৃষ্ঠা- ১৩০।
৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩০ ।
৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪১ ।
৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪৫ ।
১০. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২৭ ।
১১. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২৮ ।
১২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫১ ।
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮১ ।